আত্মদীপো ভব

প্রব্রাজিকা আপ্তকামপ্রাণা

একে একে নিভিছে দেউটি। ভগবান বুদ্ধের অতিস্নেহের শিষ্য মগধরাজ বিম্বিসার এবং শ্রাবস্তীর রাজা প্রসেনজিৎ প্রাণ দিয়েছেন অন্ধ পুত্রস্নেহের ফলে। শাস্তার উপদেশের শান্তিবারি রাজকুমারদের অন্তরের লোভ-ক্ষোভ-ক্রোধের দাবানল প্রশমিত করতে পারেনি। শাক্যসিংহের চোখের সামনেই শাক্যবংশ ধ্বংস হয়ে গেল। শ্রাবস্তীর রাজা বিরুধকের মনে শাক্যদের প্রতি যে-ক্রোধের তুষানল ধিকিধিকি জ্বলছিল, তা থেকে নিস্তার পেল না কপিলাবস্তু। বুদ্ধদেব বহু বছর তাঁকে কোনওরকমে শান্ত করে রেখেছিলেন। শেষপর্যন্ত দৈবই বলবান হল। বুদ্ধের মানসনেত্রে ধরা পড়ল, শাক্যরা পূর্বে নদীর জলে বিষ মিশিয়ে শত্রুধ্বংস করেছিলেন। এতদিনে সেই পাপের ফল পূর্ণ হয়েছে, ভোগ করতেই হবে তা। শ্রাবস্তীরাজের নিষ্ঠুর শাক্যবধলীলা চলল তিনদিন তিনরাত। প্রকৃতির অকৃপণ দানে পরিপূর্ণ কপিলাবস্তু শ্মশান হয়ে গেল। সমস্ত শস্য, অশ্ব, হস্তী, রথ ও অন্যান্য সম্পদ লুণ্ঠিত হল তার। যুবক ও প্রৌঢ়েরা সকলেই নিহত বা আহত। মন্ত্রী অম্বরীষ নারকীয় আনন্দে ছুটে এসে বিরুধককে জানালেন—কপিলাবস্তুতে কয়েকজন বৃদ্ধ ও শিশু ছাড়া আর কেউ নেই।

অঘটনঘটনপটু স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন গ্রীবা তুলে যদুবংশনাশ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, ভগবান বুদ্ধও সেই লীলার পুনরভিনয় করলেন। সংবাদ শুনে শুধু শুষ্ককণ্ঠে বললেন, ''শাক্যরা তাদের কর্মফল পেয়েছে।''

বিরুধকের মনের আগুন তখনও নেভেনি। শ্রাবস্তীতে ফিরে তিনি বুদ্ধের আর-এক প্রিয়শিষ্য রাজকুমার জেতের কাছে গেলেন। জেত তখন অলিন্দে বসে নিশ্চিন্তে বীণাবাদনরত। বিরুধকের কণ্ঠে দম্ভ গমগম করে উঠল : ''আমি কপিলাবস্তু ধ্বংস করেছি। শত্রুজয় করেছি।'' কুমার জেত যথার্থ বুদ্ধশিষ্যের মতোই শান্তগলায় বললেন, ''কে শত্রু, কে-ই বা মিত্র? শত্রুজয়ের চেয়ে প্রশস্ত হল আত্মজয়। আপনি কি তা করেছেন?''

বিরুধকের শিরায় শিরায় তখনও রক্ত ফুটছে। গর্জে উঠলেন তিনি, ''এই জেত শত্রুদের দলে। একে বধ কর্।'' তাঁর দেহরক্ষীর বর্শা তক্ষুনি ভেদ করল কুমার জেতের হৃৎপিণ্ড। আবাল্য সঙ্গী বীণাটির উপরই পড়ে রইল তাঁর দেহ, ছিন্নমূল লতার মতো।

রাজপ্রাসাদে ফিরে বিরুধক শুনতে পেলেন তাঁকে লক্ষ করে শাক্যনারীদের উপহাস। আর সহ্য হল না। মন্ত্রীকে ডেকে আদেশ দিলেন, হাত-পা

কেটে নিয়ে তাদের যেন কাঁটাবনের শুষ্ককূপে নিক্ষেপ করা হয়। ভগবান বুদ্ধ যখন এ-সংবাদ শুনলেন, ধৈর্যচ্যুতি ঘটল তাঁরও। ক্রুদ্ধ হয়ে বলে ফেললেন, ''বিরুধক সাতদিনের মধ্যে নরকাগ্নিতে প্রজ্বলিত হবে।'' এরপর তিনি কয়েকজন শিষ্যাকে সঙ্গে নিয়ে আহত নারীদের শুশ্রূষা করতে গেলেন। ক্ষতস্থানে রক্তচন্দনের প্রলেপ লাগালেন, ধৌত কার্পাসবস্ত্রে ক্ষত বেঁধে দিলেন। স্বয়ং তাদের মুখে দিলেন শীতল জল। শেষ করুণাঘন কণ্ঠে ঝরল অন্তিম উপদেশ : ''জগৎ অনিত্য। ক্ষতি যত, ক্ষত যত—সব মিথ্যা। এই দেহও অনিত্য—জলের বুকে ফেনার মতন নশ্বর। যা পড়ে রইল এই পৃথিবীতে তার জন্য আর চিন্তা রেখো না মনে। যা ঘটে গেল, তার জন্য ক্ষোভও রেখো না। শান্ত হও।''

শান্ত তারা সত্যিই হয়ে আসছিল। বুদ্ধের সঙ্গে এসেছিলেন মগধের রানি ক্ষেমা। ভিক্ষুণী হয়েছিলেন তিনি। অপার সহানুভূতিতে তিনি বললেন, ''ভগিনীরা, বলো—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।''

মৃত্যুপথযাত্রী কণ্ঠগুলিতে বহুকষ্টে উচ্চারিত হল—''বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং..., বুদ্ধং...।''

এদিকে ভগবান বুদ্ধের অভিশাপের কথা শুনে ভীত বিরুধক মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। অম্বরীষ সব শুনে অট্টহাস্য করে বললেন, ''ওই বুড়োটাকে ভয় পাচ্ছ? ইন্দীবর সরোবরের মাঝখানে আমাদের যে জলটুঙ্গী আছে সেখানে গিয়ে সাতদিন থাকো—নরকাগ্নির ঠাকুরদাও তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না।'' রাজা-মন্ত্রী সহ গোটা রাজদরবার সেখানে আশ্রয় নিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন বিরুধকের শয়নকক্ষে মানুষ-সমান আয়নায় সূর্যের কিরণ পড়ে ভয়ংকর আগুন জ্বলে উঠল। তাঁর নিজেরই মনের আগুন যেন সাকার হয়ে দগ্ধ করে দিল রাজদেহ।

শ্রাবস্তীও মৃত্যুপুরী হয়ে গেল। সেখানে তখনও সশিষ্য বুদ্ধ অবস্থান করছেন। ভিক্ষুসঙ্ঘকে পালন-পোষণ করবে কে? বুদ্ধের প্রিয়শিষ্য রাজবৈদ্য জীবক এসে তাঁকে অনুরোধ করলেন মগধের রাজধানী রাজগৃহে ফিরে যেতে। ভিষগ্‌রত্নের দৃষ্টি দিয়ে ভগবানকে দেখে জীবক বুঝেছেন, তাঁর এখন আর একটু যত্নের প্রয়োজন। তিনি জানেন, বিগত বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধদেব আটাত্তর পূর্ণ করেছেন। জীবক বললেন, ''এবার রাজগৃহে গেলে আপনাকে আর গৃধ্রকূটে থাকতে দেব না। অত উঁচু পর্বতে উঠতে হবে না আপনাকে। তার তলাতেই আমার একটা আম্রকানন আছে। আমার অনেকদিনের স্বপ্ন, সেখানে আপনি থাকবেন।''

আম্রকাননের দানপত্র তক্ষুনি লিখে ফেলে জীবক সেটা রাখলেন তথাগতের পায়ের কাছে।

বুদ্ধদেবের মনে পড়ে গেল, সারা জীবন ধরে কত বিহার কত কানন কত মহাশালা কত মহাবন লাভ করেছেন তিনি। প্রসন্ন হাসিতে ভরে গেল তাঁর মুখ। মৃদুকণ্ঠে বললেন, ''আমি শ্রমণ—তবু দেখো—আমার ভূমিলাভের সীমা নেই!''

জীবক মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিলেন। সারা জীবনের সংযম, মাধুর্য, কল্যাণচিন্তা যেন মূর্তি পরিগ্রহ করে আছে ভগবানের আননে! ওই যুগ্ম ভ্রূ, আর তার মাঝে ক্ষুদ্র একগুচ্ছ কেশের শোভা—জীবনে কারও মুখে দেখেননি জীবক। রাজলক্ষণ। কিছুদিন হল ওই ভ্রূযুগলের মধ্যে কেশগুচ্ছ সাদা হয়ে গিয়েছে—যেন শাস্তার প্রশস্ত ললাটে একবিন্দু জুঁইফুলের পাপড়ি সযত্নে লাগিয়ে দিয়েছে কেউ। গত কয়েকমাস যাবৎ পরপর ঘটে চলেছে অশুভ ভয়ংকর সব ঘটনাবলি—তথাগতের কুসুমকোমল অন্তর ক্ষতবিক্ষত—জানেন জীবক। তবু তাঁর হাসিতে কী প্রশান্তি, কী ভালবাসা! বার্ধক্য, জরার চিহ্নগুলি যেন এই রূপের প্রতিমায় এক-একটি সৌন্দর্যলক্ষণ হয়ে উঠেছে! বোধি মানুষকে এত সুন্দর করে দেয়! নিষ্পলক জীবক তাকিয়ে রইলেন। তাকিয়েই রইলেন।

ভগবান তথাগত এসেছেন রাজগৃহে। ঘটনার ঘোর ঘনঘটা অব্যাহত। সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন—সঙ্ঘে তথাগতের দক্ষিণ ও বামহস্ত স্বরূপ দুই অর্হৎ—দেহত্যাগ করলেন পক্ষকালের ব্যবধানে। দুজনেরই মর্ত্যত্যাগের কারণ মর্মন্তুদ। প্রচণ্ড পরিশ্রমে সারিপুত্রের যক্ষ্মা হয়েছিল। আর বৌদ্ধদের চিরশত্রু আজীবকেরা প্রচণ্ড প্রহার করে প্রতিটি অস্থি ভেঙে দিয়েছিল মৌদ্‌গল্যায়নের। বুদ্ধদেবের দুটি পাঁজর যেন ভেঙে গেল। ইতিমধ্যে জীবননাট্যে অভিনীত হয়ে গিয়েছে আরও অনেক বিয়োগান্ত দৃশ্য। ইহজগৎ একে একে ত্যাগ করেছেন রাহুল, রাহুলমাতা যশোধরা, মহাপ্রজাবতী গৌতমী। যথার্থই—''সর্বং শূন্যং শূন্যম্।''

এদিকে মগধরাজ অজাতশত্রু পিতৃহত্যার অপরাধ ভুলতে পারছেন না। খেতে ঘুমোতে পারেন না, বুকে সর্বদা জ্বলে অশান্তির আগুন। জীবক একদিন তাঁকে নিয়ে এলেন বুদ্ধসকাশে। তথাগতের উপদেশে তাঁর মন শান্ত হল। তবু ভগবানকে তিনি বৈশালী আক্রমণের পরিকল্পনা জানালেন। কারণ বৃজিরা গঙ্গার জল মগধকে দিচ্ছে না, বাঁধ তৈরি করে বেশি জল নিয়ে নিচ্ছে কৃষির জন্য। বুদ্ধদেব পরামর্শ দিলেন আলোচনা করে সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে। অজাতশত্রু কিন্তু তাঁকেই কলহ মিটিয়ে দিতে বললেন, ''আপনি যদি বৃজিদের বলে মিটিয়ে দিতে পারেন তো দিন। নাহলে মগধ যুদ্ধ করবেই।''

নিজের বয়স, অভাবনীয় পথশ্রম, বৈশালী-মগধের যুদ্ধং দেহি মনোভাব—সব ভুলে, শুধু শান্তির উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় তথাগত বলে উঠলেন, ''আমি কালই বৈশালী যাব।''

বৈশালী রাজ্যে ভগবান প্রথম পদার্পণ করলেন আম্রপালীর আম্রকাননে। অদূরেই কোটিগ্রামে থাকতেন আম্রপালী—বুদ্ধদেব তাঁর গৃহে এসেছেন শুনে তিনি অভিভূত। ষোলো ঘোড়ায় টানা একটি বিচিত্র রথে এলেন বুদ্ধদর্শনে। ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে প্রার্থনা করলেন উপদেশ। পর্বত থেকে চলচরণা ঝরনার মতো তথাগতের কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ল অমৃতবাণী : ''তোমার এই সুন্দর দেহ, এই যৌবন একদিন অতীত হবেই। জরা আসবেই। মানুষের দেহ কেমন জানো? কুম্ভকারের তৈরি মৃত্তিকাপাত্র—একটু আঘাতেই ভেঙে যায়। একদিন চুল সাদা হয়ে যাবে, মুখ হবে দন্তহীন, শক্তি থাকবে না। সুরকে মনে হবে বেসুর। রসকে মনে হবে নীরস। কারও নিস্তার নেই তার হাত থেকে। সে সব শুকিয়ে দেবে, শুষে নেবে, লুটে নেবে। আলো থেকে অন্ধকারে তার যাত্রা—বৎসে। কিন্তু যদি তুমি আর্যসত্যের শরণ নাও তাহলে এই দুঃখ জয় করতে পারবে।''

আম্রপালী যেপথে ফিরছেন, লিচ্ছবি নায়কেরা সেই পথেই আসছিলেন ভগবান বুদ্ধের কাছে। আম্রপালী পরদিন ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ ভগবান বুদ্ধকে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং ভগবান তা গ্রহণও করেছেন জেনে তাঁরা ক্ষুব্ধ। এমনকী আম্রপালীকে তাঁরা ওই নিমন্ত্রণ তুলে নিতে বললেন, প্রলোভন দেখালেন দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার। আম্রপালীর উত্তর ছিল, বৈশালীর রাজকোষ উপুড় করে দিলেও তিনি নিমন্ত্রণ ফিরিয়ে নেবেন না। গণনায়কদের কিছু বলার ছিল না, শুধু নিষ্ফল ক্রোধে ফুলতে ফুলতে তাঁরা বললেন, ''এতদূর!''

বাস্তবিক, তথাগতকে শ্রদ্ধা করলেও তাঁর মতাদর্শ লিচ্ছবিদের জীবনে তখনও প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু ভগবানের হৃদয়ে সকলের জন্য সমান ভালবাসা। দূর থেকে লিচ্ছবি নায়কদের আসতে দেখে তিনি ভিক্ষুদের বলেছিলেন, ''দেখো দেখো, ওদের দিকে তাকিয়ে দেখো! লিচ্ছবিদের মণ্ডলীকে সাক্ষাৎ দেবতাদের মণ্ডলী বলে মনে করবে।''

বিরাট এক সভায় সমবেত লিচ্ছবি নায়কদের বুদ্ধদেব বোঝাতে চেষ্টা করলেন, যুদ্ধের চেয়ে গঙ্গার জল ভাগ করে নেওয়া অনেক বেশি বুদ্ধিমানের কাজ। তাঁদের প্রধান নায়ক সিংহ

জানালেন, শুধু জল নয়—গঙ্গাতীরে সোনার চেয়েও মূল্যবান ধাতুর একটি খনি পাওয়া গিয়েছে, অজাতশত্রু সেইটি চান।

তথাগত এ-সংবাদ জানতেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, খনির ধাতু কি দুটি রাজ্য সমান ভাগে ভাগ করে নিতে পারে না? সিংহ রাজি হলেন না।

বুদ্ধ আবার নানা যুক্তি দিলেন। বললেন, মানুষের প্রাণ কি ধাতুর চেয়ে বেশি মূল্যবান নয়?

লিচ্ছবিরা নিরুত্তর। ভগবান বুদ্ধের মুখে শান্তিপ্রস্তাব তাঁরা মানলেন না, সেটা অজাতশত্রুর সঙ্গে সন্ধিপ্রস্তাব বলেই। কিন্তু তথাগতকে তাঁরা সম্মান জানালেন শত শত উত্তরীয় উপহার দিয়ে।

এর আগে একবার রোহিণী নদীর জল নিয়ে লিচ্ছবি আর কোলিয়দের বিবাদ বেধেছিল। যুদ্ধ হয়-হয়। সেবারও তথাগত দুপক্ষের মাঝে পড়ে যুক্তিতর্ক করে যুদ্ধ বন্ধ করেছিলেন। এবার কিন্তু আর উদ্দেশ্য সফল হল না। ভগ্নহৃদয়ে ভগবান বুদ্ধ বৈশালীর প্রান্তে বেলুবা গ্রামে গিয়ে তাঁর জীবনের শেষ বর্ষাবাস যাপন করলেন। এরপর তিনি ভাদ্রের শেষে কুশীনারা (কুশীনগর) যাত্রা করলেন। তাঁর আশা ছিল, সেখানকার মল্লরাজেরা বৈশালীকে যুদ্ধ থেকে বিরত করতে পারবেন। বৈশালী ত্যাগের আগে শুধু একবার পিছন ফিরে অস্তরবির রশ্মি-আভায় বৈশালীকে অতৃপ্ত নয়নে দেখতে দেখতে তথাগত বলেছিলেন, ''বুদ্ধের এই শেষ বৈশালী দর্শন!'' নির্বাণোন্মুখ মহামানবের বিগলিত স্নেহের প্রকাশ বিচিত্র!

পথে পাবা গ্রাম। কর্মকার চুন্দের মধ্যাহ্নভিক্ষার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন ভগবান। কিন্তু ভিক্ষাগ্রহণের সময় চুন্দের হাত থেকে যখন তিনি পাত্রটি নিতে যাবেন, তখনই উপবাণ নামে এক শ্রমণ সেটি নিয়ে আহার শুরু করে দিল। সকলে স্তম্ভিত। পাকশালায় আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। চুন্দকে উপবাণ বলল, ''ওই যে শূকরকন্দের [খাম আলু] ব্যঞ্জন আছে, ওটাই দাও।'' চুন্দ তাই করলে তথাগত সেটি মুখে দিয়েই বুঝলেন তাঁকে বিষমিশ্রিত খাদ্য দেওয়া হয়েছে। উপবাণের ক্রূর হাসি দেখে নিমেষে বুঝে নিলেন, সে বৃজির চর। মল্লরাজদের কাছে তিনি যুদ্ধ বন্ধ করতে যাচ্ছেন, বৃজির তা অভিপ্রেত নয়।

শেষরাত্রিতে তথাগতের অতিসার আরম্ভ হল। অশ্রুমুখ চুন্দকে তিনি নানাভাবে সান্ত্বনা দিলেন, বললেন, ''আমার জীবনে দুটি আহার অতি বিশিষ্ট—সুজাতার পায়সান্ন গ্রহণ করে আমি বোধিলাভ করেছিলাম। তোমার এই আহার্য গ্রহণ করে আমি মহানির্বাণ লাভ করব।''

ধীরে ধীরে কপিত্থ নদীর তীরে এলেন সুগত। বিষক্রিয়ায় বড় তৃষ্ণা, তা সংযত করতে না পেরে কপিত্থ-র কর্দমাক্ত জলই পান করলেন তিনি। এমন সময় তাঁর প্রথম গুরু আড়ার কালামের শিষ্য পুক্কুস সেখানে এলেন। বুদ্ধের দেহ মরণোন্মুখ, তবু অন্তর সকলের কল্যাণের জন্য ব্যাকুল। তিনি পুক্কুসকে দীক্ষা দিলেন। এমনকী কৃপা করে তাঁর দেওয়া সুন্দর নববস্ত্রটি পরিধানও করলেন। করুণাঘন সেই মূর্তিকে তখন দেখাচ্ছিল ভোররাত্রের পূর্ণচন্দ্রের মতো—ম্লান কিন্তু শান্তিতে মাধুর্যে প্রেমে পূর্ণ।

একটু পথ চলতেই ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন ভগবান। সেবক আনন্দ বুঝতে পারলেন তাঁর পরিনির্বাণের আর বেশি বিলম্ব নেই। অন্তিম উপদেশ প্রার্থনা করলেন তিনি। শাস্তা বললেন, ''আমার শেষ উপদেশ—'অত্তদীপা বিহরথ'—আত্মদীপ হও—নিজেই নিজের প্রদীপ হও। 'অত্তসরণা অনঞ্ঞসরণা, ধম্মদীপা বিহরথ ধম্মসরণা অনঞ্ঞসরণা।' আত্মশরণ, অনন্যশরণ হও। নিজের মুক্তির জন্য অন্যের উপর নির্ভর কোরো না। ধর্মদীপ, ধর্মশরণ হয়ে বিহার করো।''

পাবা থেকে কুশীনগর মাত্র দেড় যোজন দূরে। মধ্যাহ্নে যাত্রা শুরু করে অসুস্থ অশক্ত শরীরে পথে বারবার বিশ্রাম নিতে নিতে বুদ্ধদেব সেখানে

পৌঁছলেন সূর্যাস্তের সময়। হিরণ্যবতী নদীর পারে কুশীনগরে মল্লদের শালবন। পাশাপাশি দুটি শালগাছে অজস্র ফুল ফুটে আছে। সৌরভে পবন মন্থর। সেখানেই তথাগতের শেষশয্যা রচিত হল। হিতৈষী পিতা যেমন নিজের দেহত্যাগ আসন্ন বুঝে ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য অতৃপ্ত অন্তরে সন্তানদের নানান উপদেশ দিতে থাকেন, আসন্ননির্বাণ বুদ্ধহৃদয়েরও আজ সেই অবস্থা। উৎসমুখ খুলে-যাওয়া ফোয়ারার মতো তাঁর কণ্ঠ থেকে অনর্গল বর্ষিত হল কালোপযোগী উপদেশ।

তারপর তিনি শিষ্য আনন্দকে পাঠিয়ে মল্লরাজদের সংবাদ দিলেন—আজ রাত্রির শেষ প্রহরে তথাগতের পরিনির্বাণ ঘটবে, তাঁরা যেন এসে তাঁকে দর্শন করে যান। নচেৎ তাঁদেরই রাজ্যসীমায় বুদ্ধের দেহান্ত হল অথচ শেষদর্শন ঘটল না ভাগ্যে—এ-আক্ষেপ চিরকাল তাঁদের তাড়না করবে। মল্লগণ সে-সংবাদ শুনে দলে-দলে এসে ভগবানকে শেষবারের মতো দর্শন ও বন্দনা করে গেলেন। সুভদ্র নামে এক ব্যক্তি সেই মহালগ্নে তাঁর কাছে এসে উপদেশ শুনে মুগ্ধহৃদয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রার্থনা করলেন, লাভও করলেন। ইনিই তথাগতের শেষ সাক্ষাৎ ভিক্ষু-শিষ্য।

বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদ জ্যোৎস্নার সাগরে পৃথিবীকে মগ্ন করে এক অপার্থিব মায়াময় পরিবেশ রচনা করেছে। নিস্তব্ধ ধরণী যেন শ্বাস রুদ্ধ করে এক মহাঘটনার প্রতীক্ষা করছে। সহসা জগৎ-সংসারের নীরবতা ভঙ্গ করে তথাগতের করুণাঘন কণ্ঠ বেজে উঠল ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশে : ''বুদ্ধের অবর্তমানে তোমরা মনে কোরো না—তোমাদের শাস্তা অন্তর্হিত হয়েছেন। যে-ধর্মবিনয় তিনি উপদেশ করেছেন, তা-ই তোমাদের শাস্তা, তা-ই তোমাদের শিক্ষাগুরু। বুদ্ধ, ধর্ম বা সঙ্ঘ সম্পর্কে কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে এখনই তা করে নাও।'' সকলেই নীরব। ভগবান আবার বললেন, ''যৌগিক [সৃষ্ট] পদার্থমাত্রই বিনাশশীল। তাই আলস্য না করে জীবনের মূল লক্ষ্যের দিকে তাড়াতাড়ি এগোও।''

বুদ্ধবাণী স্তব্ধ হল। ধ্যানমার্গে স্তরের পর স্তরে আরোহণ করে, অবশেষে তথাগত মহানির্বাণে পরিনির্বাপিত হলেন। ঠিক আশি বছর আগে, এমনই এক প্রকৃতি-আকুল-করা বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে লুম্বিনী কানন জ্যোতির্ময় করে যে-মহাসত্তা দেহধারণ করেছিলেন, আজ যুগ্ম শালতরুমূলে তিনি নির্বাণসমুদ্রে প্রবিষ্ট হলেন। রেখে গেলেন অনাগত কালের জন্য মহাশান্তি, মহাপ্রেম।

প্রকৃতির প্রাণের অঞ্জলি ঝরে পড়ল তাঁর পূতদেহের উপর—শালপুষ্প হয়ে।

কিছুদিন আগেই যিনি সকৌতুকে লক্ষ করেছিলেন শ্রমণ হয়েও তাঁর ভূমিলাভের সীমা নেই, শত শত বিহার কানন ভবন রাজপ্রাসাদ যাঁর অঙ্গুলিহেলনে চালিত, তিনি নির্বাণ নিলেন কারও রাজ্যে নয়, ভবনে নয়, এমনকী বিহার বা কাননেও নয়—দুটি রাজ্যের সীমায় প্রকৃতির ক্রোড়ে। অজাতশত্রুর ব্যবহারে বলা যায় তিনি পরোক্ষে মগধ থেকে বহিষ্কৃতই করেছেন তথাগতকে, আর বৃজিরা তাঁকে বিষ দিয়েছে। আশি বছরের বৃদ্ধ দেবপুরুষ—বিষক্রিয়ায় অতিসারে আক্রান্ত—তাঁর পথ অতিবাহনের জন্য কোনও যান জুটল না? কোনও চিকিৎসক? আক্ষেপ জাগে, ভিষগ্‌রত্ন জীবক সঙ্গে থাকলে হয়তো তথাগতের বিষক্রিয়া রোধ করতে পারতেন। ক্ষোভ জাগে, যাঁকে বিখ্যাত শিষ্যা প্রণাম করতে আসেন ষোলো চাকার রথে চেপে, তাঁকে অসুস্থদেহে দেড় যোজন অতিক্রম করতে হয় পথের ধূলায় বারবার বসে পড়তে পড়তে! কয়েক শতক পরে আর-এক অবতারপুরুষ যথার্থই বলবেন, ''শেয়ালেরও গর্ত আছে, কিন্তু ঈশ্বরপুত্রের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই।''

বুদ্ধের শেষ আহার নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে।

অধিকাংশের মতে খাদ্যটি ছিল 'সূকরমদ্দব'—একরকম 'রসায়ন' যা বুদ্ধের দুর্বল শরীরে বলসঞ্চারের জন্য চুন্দ শ্রদ্ধাভরে প্রস্তুত করেছিলেন। আবার অনেকে মনে করেন সেটি ছিল শূকরমাংসের এক জনপ্রিয় সুস্বাদু পদ—যা বুদ্ধ গ্রহণ করেন চুন্দের আন্তরিকতাকে উপেক্ষা করতে না পেরে। এইসব মতে দেখা যায়, বুদ্ধদেব নিজে বস্তুটি গ্রহণ করলেও কোনও অজ্ঞাত কারণে, অথবা সম্ভবত গুরুপাক ভেবে, ভিক্ষুদের সেটি খেতে দেননি। এই প্রবন্ধে এই সংক্রান্ত যে-ঘটনাটি বর্ণিত হল, তা হল এটি অপেক্ষাকৃত কম প্রচার পেয়েছে বলেই; এবং প্রাপ্ত তথ্যগুলি বিচার করে তাকে বেশি যুক্তিসহ বলে মনে হয়েছে বলেই।

'আত্মদীপা বিহরথ'—আত্মদীপ হয়ে বিহার করো—নিজেই নিজের দীপ হও, নিজের মুক্তির জন্য অন্যের উপর নির্ভর কোরো না—একথা ভগবান বুদ্ধের উপদেশের নির্যাস বললে অত্যুক্তি হবে না। অনন্যচিন্ত হয়ে ধর্মকে আশ্রয় করে থাকলে মানুষ নিজে নিজেই বিকশিত হয়, তার আর আর বাহ্য সহায়তার প্রয়োজন হয় না। নিছক কৌতূহল মেটানোর জন্য দার্শনিক বা তাত্ত্বিক আলোচনাকে তথাগত একেবারেই প্রশ্রয় দেননি। এমনকী তাঁর পন্থায় চলে মানুষ কোন্ অবস্থায় পৌঁছবে সে-সম্পর্কেও তিনি নীরব। কেন তিনি তত্ত্বকথা এড়িয়ে চলেন তা বুঝিয়ে দিতে একবার তিনি বলেন, একজন মানুষ বিষাক্ত বাণে আহত হয়েছে। তার চিকিৎসার জন্য দক্ষ চিকিৎসক আনা হলে সে যদি বলে, তার আততায়ী লম্বা না বেঁটে, ফরসা না কালো, অভিজাত না সাধারণ মানুষ—এসব আগে না জেনে সে চিকিৎসা করাবে না, তাহলে তার কথাকে প্রলাপ বলা হবে। ঠিক তেমনি, দুঃখবাণে বিদ্ধ মানুষের চিকিৎসার বিষয়টিই প্রধান—সেখানে জগৎ অনন্ত না সান্ত, শাশ্বত না নশ্বর, মৃত্যুর পর মানুষের অস্তিত্ব থাকে কি না এসব নিয়ে আলোচনা অবান্তর। এজন্যই বুদ্ধদেব জগৎ, ঈশ্বর, আত্মা ইত্যাদি প্রসঙ্গে নীরব থেকেছেন। অধ্যাত্মসমস্যার ব্যাবহারিক দিকটি—অর্থাৎ শুধু তন্‌হা বা তৃষ্ণানিবৃত্তির দিকেই তাঁর লক্ষ ছিল।

দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে উপেক্ষা না করে কীভাবে মানুষ জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ে নির্বাণের পথে অগ্রসর হতে পারে, ভগবান বুদ্ধের নির্দেশিত চতুর্থ আর্যসত্যে (দুঃখনিরোধমার্গ) তার একটি সুস্পষ্ট দিক দেখা যায়। এই মার্গ আটটি অঙ্গবিশিষ্ট বলে একে অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলা হয়। সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি—এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ অভ্যাসের উপর তথাগত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এটি পালন করলে মানুষ নিজে নিজেই নির্বাণের পথে অগ্রসর হতে পারবে, আধ্যাত্মিক গুরুর প্রয়োজন তার হবে না—এই ছিল তাঁর আশয়। ব্যক্তিমানবকে এতখানি স্বাধীনতা দেওয়ার মধ্যেই তাঁর অন্তরের ঔদার্যের পরিচয়। ✠

সহায়ক গ্রন্থ

১। রাহুল সাংকৃত্যায়ন, *মহামানব বুদ্ধ*, অনুবাদ : অভিজিৎ ভট্টাচার্য (চিরায়ত প্রকাশন : কলকাতা, ২০১৩)

২। দীপ্তি ত্রিপাঠী, *হে অনন্তপুণ্য* (দাশগুপ্ত এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ : কলকাতা, ১৯৮৭)

৩। ডঃ সুকোমল চৌধুরী, *মহামানব গৌতম বুদ্ধ* (মহাবোধি বুক এজেন্সি : কলকাতা, ২০১১)

নিবেদন

প্রয়োজনীয় সব মূলগ্রন্থ দেখার সুযোগ লেখকের না হলেও, যেসব গ্রন্থের সাহায্যে এ-প্রবন্ধ রূপ পেয়েছে সেগুলি প্রাচীন পালি ও সংস্কৃত, তিব্বতি ও চিনা সাহিত্য অবলম্বনেই রচিত। সহায়ক গ্রন্থগুলির স্বনামধন্য লেখকেরা বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। বহু ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রন্থে একই ঘটনার বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে যেটি অধিকতর যুক্তিবুদ্ধিগ্রাহ্য সেটিই গৃহীত হয়েছে।